চর্যাপদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) এর উপর।
চর্যাপদের আবিষ্কর্তা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে। প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
চারটি পুঁথির মধ্যে কেবল চর্যাপদ পুঁথিটিরই ভাষা বাংলা।
মহাসুখ রূপ নির্বাণ লাভের পথে যা আচরণীয় যা 'চর্য্য' আর যা অনাচরণীয় বা 'অচর্য্য' তাকে সুনিশ্চিত বা 'বিনিশ্চয়' করে বলা হয়েছে বলে এই গ্রন্থটির নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চিয়'।
ড. শশীভূষণ দাসগুপ্ত নেপাল থেকে আরো কিছু পদ সংগ্রহ করেন, যেগুলোর নাম দেন 'নব চর্যাগীতি'। তিনি ১০১টি পদ নেপাল থেকে খুঁজে পেয়েছেন।
রচনাকাল সম্পর্কে সুনীতিকুমার ও শহীদুল্লাহর মত- এই দুই মতই বেশ প্রভাবশালী।
চর্যাপদের মোট গানের সংখ্যা ৫১টি। শাস্ত্রী মহাশয় যে-পুঁথিটি আবিষ্কার করেছিলেন, তাতে পাওয়া গিয়েছে সাড়ে ৪৬টি পদ। পুঁথির পাতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যাক পদের পুরোটাই এবং ২৩ সংখ্যাক পদের শেষাংশ পাওয়া যায় নি।
৫১টি পদের তথ্য পাওয়া গিয়েছে চর্যাপদের। তিব্বতী সংস্করণের মাধ্যমে। সেখান থেকে জানা গেছে মুণি দত্ত ছিলেন চর্যাপদের সংস্কৃত টীকাকার এবং বৌদ্ধতন্ত্রে অভিজ্ঞ। মুণি দত্ত পঞ্চাশটি চর্যার ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং ১টি পদের টীকা বা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদকের নাম কীর্তিচন্দ্র। তিব্বতী অনুবাদ করেন ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ১৯৩৮ সালে।
মুণি দত্তের সংস্কৃত টীকা এবং ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী কর্তৃক আবিষ্কৃত চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদের কারণে আমরা চর্যার আক্ষরিক অর্থ ও গূঢ়ার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি।
রাহুল সাংকৃত্যায়ন
চর্যাপদের পদগুলোর ৫টি ভাষার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়-বাংলা, হিন্দি, মৈথিলী, অসমীয়া ও উড়িয়া।
এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
সেই কারণে চর্যার ব্যবহৃত ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন সন্ধ্যাভাষা।
বজ্রযানী ও সহজযানী গ্রন্থকাররাও একে 'সন্ধ্যাভাষা বোদ্ধব্যম' বলে রহস্যের ইঙ্গিত দিতেন।
এঁদের বেশির ভাগই বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরু-শিস্য পরম্পরা 'চৌরাশি সিদ্ধা'-র অন্তর্গত।
চর্যাপদের কবিগণের মধ্যে তান্ত্রীপা ও লাড়ীডোম্বীপার পদ পাওয়া যায়নি।
চর্যাপদের প্রধান কবি এবং সবচেয়ে বেশি পদ রচয়িতা কাহ্নপা। তাঁর অন্য নাম কৃষ্ণাচার্য। সঙ্কলনটিতে তাঁর ১৩টি পদ গৃহীত হয়েছে।
ভুসুকুপা সংখ্যার বিচারে চর্যার দ্বিতীয় প্রধান কবি। তাঁর পদের সংখ্যা ৮। ভুসুকুকে বাঙালি বলে অনুমান করা হয়।
লুইপা প্রথম বাঙালি কবি। তাঁর কবিতায় 'পঙআ' খালের (পদ্মা) উল্লেখ রয়েছে। তবে ড. শহীদুল্লাহ দেখিয়েছেন, প্রাচীনতম চর্যাকার হলেন শবরপা।
২৮ ও ৫০ সংখ্যক পদের রচয়িতা শবরপা চর্যার শ্রেষ্ঠ কবি। ১৪ পঙ্‌ক্তির রচনা দুটো প্রথম শ্রেণির কবিত্বের দৃষ্টান্ত।
তন্ত্রীপা [পদ নং-২৫ (পাওয়া যায়নি)] চর্যাপদের গীতিকায় তান্ত্রীপার পদটিই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এজন্য তার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।
শবরপা [পদ নং-২৮ ও ৫০]
ড. শহীদুল্লাহর মতে, তিনি চর্যার আদি পদকর্তা। তাঁর জীবনকাল অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ (৬৮০ থেকে ৭৬০ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ছিলেন বাঙালি ও ব্যাধ এবং লুইপার গুরু এবং নাগার্জুনের শিষ্য। সংস্কৃত ও অপভ্রংশ মিলে তিনি ১৬টি গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি চর্যাপদের ২৮ ও ৫০ নং পদে রচয়িতা। তাকে চর্যার শ্রেষ্ঠ কবি মনে করা হয়।
লাড়ীডোম্বীপা-তাঁর কোন পদ পাওয়া যায়নি।
১৯২৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি ডি-লিট ডিগ্রি লাভ করেন।
এতে ছয়টি প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত প্রবাদ বাক্যগুলোর মধ্যে দুটি হলো- ১. আপণা মাংসে হরিণা বৈরী। ২. দুহিল দুধু কি বেন্টে সামায়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী কালে রচিত সাহিত্যকে মধ্যযুগের সাহিত্য বলা হয়। প্রধান ধারা ৪টি।
বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ:
সৈয়দ আলী আহসান এ সময়কালকে প্রায় শূন্যতার যুগ বলে উল্লেখ করেছেন। তুর্কী আক্রমণকারীদের ভয়ে বৌদ্ধ কবিগণ বঙ্গদেশ থেকে নেপালে শরণার্থী হয়েছিলেন বলেন ধারণা করা হয়।
ডাক ও খনার বচন
বড় জালালি ও ছোট জালালি: নিরঞ্জনের রুম্মা:
'নিরঞ্জনের রুম্মা' বা বড় জালালি কলিমা এবং শেষোক্ত গ্রন্থে ছোট জালালি রয়েছে।

১. শূন্যপুরাণ: শূন্যপুরাণ ধর্মীয় তত্ত্বের গ্রন্থ-গদ্য পদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য।
২. সেক শুভোদয়া: সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ুদ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া' সংস্কৃত গদ্য-পদ্যে লেখা চম্পুকাব্য। জয়দেব, শেখের গৌরব ব্যাখ্যাই এই পুস্তিকার উপজীব্য। বাংলা ভাষায় পীর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।

রামাই পণ্ডিত
শূন্যপুরাণের গ্রন্থোক্ত নাম 'আগমপুরাণ'। শূন্যপুরাণ সম্পাদক প্রদত্ত নাম।

শূন্যপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্ব
তারপর ব্রহ্মাকে সৃষ্টির, বিষ্ণুকে পালনের এবং শিবকে সংহারের ভারত দেয়া হলো।

খনা ও তার বচন
খনার বচনে কৃষি ও আবহাওয়া বিষয়ক কথা পাওয়া যায়।
খনা ছিলেন জ্যোতিবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ও গনিত পারদর্শী এক প্রাচীন কিংবদন্তী মহিলা।

ডাকের বচন
ডাকের বচনে জ্যোতিষ ও ক্ষেত্রতত্ত্বের এবং মানুষ চরিত্রের কথা পাওয়া যায়।
তিব্বতি ভাষায় ডাক শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাপন। এগুলো মোটামুটি একই ছন্দে রচিত, দুই চরণে অন্ত্যমিল রয়েছে।

ডাকের বচন
আপনার চেয়ে পর ভাল, পরের চেয়ে জঙ্গল ভাল
ভিক্ষা চাইনা মা তোর কুত্তা সামলা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

মধ্যযুগের প্রথম কাব্যগন্থ হলো 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এটি সর্বজনস্বীকৃত খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটির রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। তিনি মধ্যযুগের আদি বা প্রথম কবি। তাঁর প্রকৃত নামম ছিল অনন্ত।
রচনাকালের দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় গ্রন্থ হলো শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। এর রচনাকাল চতুর্দশ শতক। এটি নাট-গীত (গীতি-নাট্য)– ভঙ্গিতে তের খণ্ডে রচিত। সমস্ত কাব্যে মোট তিনটি চরিত্র আছে- রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি।
বড়ায়ি কুট্টিনী চরিত্র।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা সাগর গোয়ালার কন্যা। তাঁর আর এক নাম চন্দ্রাবলী। তাঁর মায়ের নাম পদুমিনী।

বসন্তরঞ্জন রায়
বসন্তরঞ্জন রায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম পণ্ডিত।

মনসামঙ্গল কাব্য

- আদি কবি- কানাহরি দত্ত
- শ্রেষ্ঠ কবি- বিজয়গুপ্ত
- অন্যান্য কবিগণ- বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, নারায়ণদেব।
- চরিত্র- চাঁদ সাওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর, মনসা

চণ্ডীমঙ্গল

- আদি কবি– মানিক দত্ত
- শ্রেষ্ঠ কবি/প্রধান কবি– মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
- মুকুন্দরামের উপাধি– কবিকঙ্কন
- মুকুন্দরামকে কবিকঙ্কন উপাধি দেন– জমিদার রঘুনাথ রায়
- অন্যান্য কবি– দ্বিজ মাধব, দ্বিজরাম দেব, মুক্তরাম সেন
- চরিত্র– ফুল্লরা, কালকেতু, ধনপতি, ভাড়ুদত্ত, মুরারী শীল

ধর্মমঙ্গল

- প্রথম বা আদি কবি– ময়ূরভট্ট
- প্রধান কবিগণ– রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী
- অন্যান্য কবি– খেলারাম, নরসিংহ বসু, শ্যাম পণ্ডিত
- চরিত্র– লাউসেন, হরিশচন্দ্র

অন্নদামঙ্গল

- আদি এবং শ্রেষ্ঠ কবি– ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
- ভারতচন্দ্রের উপাধি– রায় গুণাকর
- মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠকবি– ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
- ভারতচন্দ্রকে রায় গুণাকর উপাধি দেন– রাজা কৃষ্ণচন্দ্র
- চরিত্র– ঈশ্বরী পাটনী, হীরামালিনী

কালিকামঙ্গল

- আদি কবি– কবি কঙ্ক
- বিশিষ্ট কবি– রাম প্রসাদ সেন
- অন্যতম কবি– রমাপদ সেন, সাবিরিদ খান

১. মনসামঙ্গল কাব্যের আদি রচয়িতা কে?
ক. বিপ্রদাস পিপিলাই খ. কেতকামণ্ডল
গ. কানা হারিদত্ত * ঘ. বিজয়গুপ্ত

২. 'চাঁদ সওদাগর' মধ্যযুগের কোন মঙ্গলকাব্যের চরিত্র?
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. ধর্মমঙ্গল
গ. মনসামঙ্গল * ঘ. কেরাতমঙ্গল

৩. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি কে?
ক. মানিক দত্ত খ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী *
গ. ভাড়ুদত্ত ঘ. ভারতচন্দ্র

৪. মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?
ক. কানাহরি দত্ত খ. বিজয়গুপ্ত
গ. মানিকদত্ত ঘ. ভাড়ুদত্ত *

৫. 'কালকেতু'- নিচের কোন মঙ্গল কাব্যের চরিত্র?
ক. ধর্মমঙ্গল খ. চণ্ডীমঙ্গল *
গ. মনসামঙ্গল ঘ. অন্নদামঙ্গল

৬. কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে 'কবিকঙ্কন' উপাধি দেন কে?
ক. জমিদার গৌরচন্দ্র খ. রাজা কৃষ্ণচন্দ্র
গ. রাজা রামমোহন রায় ঘ. জমিদার রঘুনাথ রায় *

৭. বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি কে?
ক. শামসুর রাহমান খ. ভারতচন্দ্র *
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. সমর সেন

৮. 'হীরামালিনী' বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যের চরিত্র?
ক. শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন খ. অন্নদামঙ্গল *
গ. চণ্ডীমঙ্গল ঘ. ধর্মমঙ্গল

৯. ভারতচন্দ্রকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দেন কে?
ক. জমিদার রঘুনাথ খ. জমিদার প্রাণনাথ
গ. রাজা কৃষ্ণচন্দ্র * ঘ. রাজা গৌরচন্দ্র

১০. 'রাজা হরিশচন্দ্রে গল্প' বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যের অন্তর্গত?
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. ধর্মমঙ্গল *
গ. অন্নদামঙ্গল ঘ. কালিকামঙ্গল

মঙ্গল কাব্য

মঙ্গলকাব্য পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে অষ্টদশ শতকের শেষার্ধে রচিত হয়েছিল।
মঙ্গলকাব্যের প্রধান শাখা ৩টি–
মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান ধারা দুটি–
যে কোনো মঙ্গলকাব্যে পাঁচটি অংশ থাকবে–

মনসামঙ্গল কাব্য

মনসা দেবীর অপর নাম কেতকা ও পদ্মবর্তী।
মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি (কানা) হরিদত্ত। (কানা) হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস, বিপ্রদাস পিপলাই, কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ
মনাসামঙ্গল কাব্যধারায় পনের শতকের কবি।
মনসামঙ্গর কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন- বিজয় গুপ্ত।
নারায়ণদেব রচিত গ্রন্থের নাম 'পদ্মাপুরাণ'।
কবি বিপ্রদাস পিপিলাই ১৪৯৫ সালে 'মনসাবিজয়' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।
চন্দ্রবতী।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

এটি মঙ্গল কাব্যধারার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি, খুল্লনা, লহনা ভাড়ু দত্ত মুরারীশীল।
চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি হলেন মানিক দত্ত।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। বর্ধমান জেলার রত্মা নদীর কূলে দামুন্যা গ্রামে কবির জন্ম। কাব্য রচনার স্বীকৃতস্বরূপ রঘুনাথ কবিকে 'কবিকঙ্কন' উপাধি প্রধান করেন। ভাড়ু দত্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঠগ চরিত্র।

অন্নদামঙ্গল কাব্য

অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। তিনি মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি। ভারতের হাওড়া জেলার পেঁড়ো গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'রায় গুণাকর' উপাধি প্রধান করেন। তাকে নাগরিক কবি বলে অভিহিত করা হয়। ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

অন্নদামঙ্গলের উল্লেখযোগ্য চরিত্র– মানসিংহ, ভবানুন্দ, বিদ্যা, সুন্দর, মালিনী ইত্যাদি।
এছাড়া ভারতচন্দ্র 'সত্য নারায়ণ পাঁচালী', 'রসমঞ্জুরী' (অনুবাদ), কাব্যটির মূল রচয়িতা ভানু দত্ত।

বিখ্যাত প্রঙক্তি:

১. আমার সন্তান যেন থকে দুধে ভাতে।
২. নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?
৩. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
৪. বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
৫. বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্মমঙ্গল ধারার প্রখ্যাত কবিগণ হলেন ময়ূরভট্ট, আদি রূপরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রমুখ।
ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার প্রথম কবি হলেন ময়ূরভট্ট। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ নাম 'হাকন্দপুরাণ'।
ধর্মপাঁচালির দ্বিতীয় কবি আদি রূপরাম।
ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যধারায় অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি। 'শ্রী ধর্মমঙ্গল'-এর উপজীব্য বিষয় বিষয় হলো লাউ সেনের কাহিনী।

কালিকামঙ্গল কাব্য

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের আদি কবি হলেন কবি কঙ্ক।

সারিবিদ খান (শাহ বারিদ খান) ছিলেন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা। হযরত মুহম্মদ (স.) এর রাজ্য জয়, তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা হচ্ছে 'রসূল বিজয়' গ্রন্থের বক্তব্য।
রাম প্রসাদ সেন কালিকামঙ্গলের বিশিষ্ট কবি। তিনি শ্যামসঙ্গীত রচনায়ও অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দান করেন।

জীবনী সাহিত্য
শ্রী চৈতন্যদেব এবং তাঁর কতিপয় ভাব শিষ্যের জীবন কাহিনী নিয়ে জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি।
'জীবে প্রেম করে সেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'
রুক্মিনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।
কড়চা শব্দের অর্থ ডায়রি বা দিনলিপি। 'মুরারি গুপ্তের করচা'।
বাংলাভাষায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'।
বাংলা ভাষায় রচিত সবচেয়ে তথ্য বহুল জীবনী গ্রন্থ 'শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত'। এটি কৃষ্ণাদাস কবিরাজ কর্তৃক রচিত এবং শ্রেষ্ঠ চৈতন্য জীবনী।
অদ্বৈত আচার্য ছিলেন এ ধরনের একজন ব্যক্তি।
সৈয়দ সুলতান জীবনি সাহিত্যে লিখেছেন- নবীবংশ, শব-ই-মিরাজ ও রসূলবিজয়।

শ্রী চৈতন্যদেব
শ্রী চৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারি শনিবার নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে পুরীতে মারা যান।

অনুবাদ সাহিত্যে

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ কবিরা অনুবাদ হাত দিয়েছিলেন। সংস্কৃত থেকে (মহাভারত, রামায়ণ, ভাবগত)

রামায়ণ
রামচরিত-অবলম্বনে বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচনা করেন।
বাল্মীকির মূল নাম দস্যু রত্নাকর।
'বল্মীকি' মানে হলো উইপোকা।
রামায়ণেল প্রথম অনুবাদক পনের শতকের কবি কৃত্তিবাস ওঝা। তিনি হলেন প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। কৃত্তিবাসের রামায়নের অন্য নাম ('শ্রীরাম পাঞ্চালী')। এটি প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮০২-১৮০৩ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারী ছাপাখানায় উইলিয়াম কেরীর উদ্যোদে।

সতেরো শতকের কবি চন্দ্রাবতী (১৫৫০-১৬০০) রামায়ণ অনুবাদ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্রের প্রথম বাঙালি মহিলা কবি।

মহাভারত
মহাভারতের মূল রচয়িতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। বেদ এর ব্যাখ্যা করেছিলেন বলে তাঁর অপর নাম বেদদাস। রামায়ণের ন্যায় মহাভারতেরও উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলভেদ পৃথক পৃথক আঞ্চলিক রূপ প্রচলিত ছিল।
একমাত্র কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও কাশীরাম দাস ছাড়া আর কোনো বাঙালি কবি সম্পূর্ণ মহাভারত রচনায় প্রয়াসী হননি।
ষোড়শ শতকে সুদূর চট্টগ্রাম পরাগল খানের নির্দেশে কবীন্দ্র পররেমশ্বর মহাভারত রচনা করেন এবং তা পরাগল খানের সভায় পঠিত হয়।
কবীন্দ্র পরমেশ্বর আদি অনুবাদক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।
ছুটি খানের প্রকৃত নাম নসরত খান, ইনি পরাগল খানের পুত্র।
সতের শতকের কবি কাশীরাম দাস হলেন মহাভারতের বিখ্যা ও জনপ্রিয় অনুবাদক।

ভাগবত
হিন্দুধর্মের এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন মালাধর বসু। বাদশাহ রুকনউদ্দিন বররক শাহের কাছ থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করেন। তাঁর ভাগবতের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'।

কোরআন শরীফ: তিনি ১৮৮৬ সালে কোরআন শরীফ অনুবাদ করেন। কোরআন শরীফ অনুবাদ ছাড়াও তিনি 'তাপসমালা' রচনা করেন 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' অবলম্বনে। তাঁর বাড়ি ছিল নরসিংদী জেলায়। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসারী।

শাহ মুহম্মদ সগীর

পনেরন শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচনা করেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। তিনি মধ্যযুগের প্রথম মুসলিম কবি ও ইউসুফ জোলেখা কাব্যের প্রথম কবি।
এ কাব্যের কাহিনী মিশরের।
তৈমুর বাদশাহ-কন্যা জুলেখা এবং ক্রীতদাস ইউসুফের প্রণয় কাহিনী। তবে ইউসুফ জোলেখা কাহিনী কাব্য, গীতি কাব্য নয়।

দৌলত উজির বাহরাম খান
ষোল শতকের কবি দৌলত উজির বাহরাম খান ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমাখ্যান 'লায়লা ওয়া মজনুন' অবলম্বনে রচনা করেন 'লায়লী মজনু' কাব্য। এ কাহিনীর মূল উৎস আরবী লোকগাঁথা। এর উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হলো- লাইলী, কয়েস, নওফলরাজ, হেতুবতী।
এটি বিরহের কাব্য।
বাহরাম খানের অপর কাব্য হলো ইমাম বিজয়।

রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে রোসাঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়।
দৌলথ কাজী
তিনি লৌকিক কাহিনীর আদি কবি।
সতীয়ময়না ও লোর চন্দ্রানী কাব্য রচনা করেন। তাঁর মৃত্যুর বিশ বছর পর আলাওল কাব্যটির দ্বিতীয় জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনা এবং সম্পূর্ণ তৃতীয় খণ্ড রচনা করেন।

সৈয়দ আলাওল
আলাওল মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি। মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান অতি ঊর্ধ্বে।
আলাওল রোসাঙ্গ রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত কবি। 'পদ্মাবতী' তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য। 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান' 'সপ্তপয়কর' 'তোহফা' সিকান্দরনামা'।
রাতুল মানে হলো লাল আর পানের আরেক নাম তাম্বুল
এটি নীতিকাব্য ধরনের ধর্মীয় গ্রন্থ।
এছাড়া একজন সঙ্গীতবিদ হিসেবে তিনি রচনা করেন রাগতালের ধ্যান ধারণা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত 'রাগতালনামা'।

কোরেশী মাগন ঠাকুর
মূলত তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্য চর্চা হয়েছিল। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'চন্দ্রাবতী'।
সতের শতকের কবি মরদন রচিত কাব্যের নাম 'নসীরানামা'।

বৈষ্ণব পদাবলি

বৈষ্ণব পদাবলি কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পদ বা পদাবলি মূলত বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি, বৈষ্ণব ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যা। চতুর্দশ শতকের শেষদিক থেকে এ কবিতা রচিত হয়ে থাকে।
এর বিষয়বস্তু রাধা ও কৃষ্ণের (রূপাশ্রয়ে ভক্ত ও ভগবান) প্রেমলীলা।
শ্রীকৃষ্ণের অনুসারীরা বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেন। শ্রেষ্ঠ চারজন কবি হলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস।
বৈষ্ণব পদাবলি যিনি প্রথম সংকলন করেন তাঁর নাম বাবা আউল মনোহর দাস। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে তিনি 'পদসমুদ্র' গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলি সংকলিত করেন।
ফলে এক প্রাচীন গোপজাতির লোকগাঁথার নায়ক
বৈষ্ণব পদাবলিতে পাঁচটি রস আছে– শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এ পদাবলিতে বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটেছে।
বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভা কবি। তিনি 'মৈথিলির কোকিল' ও 'অভিনব জয়দেব' নামে খ্যাত হয়েছেন। রাজা শিবসিংহ তাকে 'কবিকণ্ঠহার' উপাধিতে ভূষিত করেন।
তিনি গীতগোবিন্দ কাব্যের রচয়িতা।
বাংলা ভাষায় এবং ওড়িয়া ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলীর সূচনা জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদাবলী থেকে বলে ধারণা করা হয়।
তিনি বাঙালি না হয়েও বাংলায় কবিতা রচনা না করেও বৈষ্ণব পদাবলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।
বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা এবং প্রথম অবাঙালি কবি।
বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদের আদলে রবীন্দ্রনাথ তার ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি রচনা করেছেন।

গোবিন্দ দাস
পদ ব্রজবুলি ভাষায় রচিত
'গীতগোবিন্দ' তাঁর বিখ্যাত পদাবলি সাহিত্য। এটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত।

চণ্ডীদাস/ দ্বিজ চণ্ডীদাস
বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা চণ্ডীদাস।
বাংলা সাহিত্যে তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে খ্যাত। তিনি খাঁটি বাংলা ভাষায় পদ রচনা করেন।

নাথ সাহিত্য/শাক্ত পদাবলি

নাথ সম্ভবত তিব্বতী শব্দ এবং 'নাথ' মাত্রই অভিধায় বৌদ্ধ সম্পৃক্ত। তাঁতিশ্রেণির বৌদ্ধরাই প্রধানত নাথপন্থী। এরা নাথযোগী বা যুগী নামে পরিচিত। এদেরই একটি বিরাট অংশ ইসলাম বরণ করে জোলা (জুলহা) নামে পরিচিত হয়েছে।
দশম ও একাদশ শতক ছিল নাথ ধর্মের বিকাশের ঐতিহাসিক যুগ এবং নাথ ধর্মের এই শ্রেষ্ঠ যুগেই নাথ সাহিত্যের সূচনা। নাথ সাহিত্যে আদিনাথ শিব, পার্বতী, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা, ময়নামতি ও গোপীচন্দ্রের আখ্যান প্রভৃতি সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য।
১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে জর্জ গ্রিয়ার্সন রংপুর থেকে সংগৃহীত একটি গীতিকা 'মানিক রাজার গান' নামে প্রকাশ করেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়' আবিষ্কার করেন। 'গোরক্ষবিজয়' এর ষোলখানা পুথি সংগৃহীত হয়েছে।

শেখ ফয়জুল্লাহ
নাথ বিশ্বাস-জাত যোগের মহিমা এবং নারী ব্যভিচার-প্রধান সমাজচিত্রের বর্ণনা গোরক্ষবিজয়-এর উপজীব্য বিষয়। এটি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ।

মর্সিয়া সাহিত্য
মর্সিয়া শব্দটি আরবি। এর অর্থ শোক বা আহাজারি।
মুঘল আমলে যে সব কবি মর্সিয়া সাহিত্য রচনা করেছেন তারা হলেন শেখ ফয়জুল্লাহ, দৌলত উজির বাহরাম খান, মুহম্মদ খান, হায়াৎ মামুদ, জাফর হামিদ প্রমুখ।
তাঁর 'জয়নবের চৌতিশা' প্রথম মর্সিয়া ধরনের কাব্য।
এতে কেবল একটিমাত্র চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে।
শেখ ফয়জুল্লাহর নীতিকথা বিষয়ক কাব্য হলো 'সুলতান জমজমা'।
মর্সিয়া ধারার হিন্দু কবি হলেন রাধারমণ গোপ।

শায়ের ও কবিওয়ালা
আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু সমাসে 'কবিওয়ালা' এবং মুসলমান সমাজে 'শায়েব'-এর উদ্ভব ঘটে।
এ সাহিত্যে কলকাতার সস্তা প্রেস থেকে বের হত বলে একে বটতলার পুঁথি বলা হয়।

শায়ের
'শায়ের'-দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোহম্মদ দানেশ। হুগলি জেলার বালিয়া পরগনার হাফিজপুর গ্রামের অধিবাসী।
ফকির গরীবুল্লাহজ দোভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হলো 'জঙ্গনামা'। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলো হলো 'সোনাভান', 'আমীল হামজা', 'ইউসুফ জুলেখা', সত্যপীরের পুঁথি'।
সৈয়দ হামজা (আনু. ১৭৫৫-১৮১৫) দোভাষী পুথি রচয়িতা। সৈয়দ হামজা এ ধারার দ্বিতীয় প্রধান ও জনপ্রিয় কবি।
সৈয়দ হামজার দ্বিতীয় কাব্য আমীর হামজা (১৭৯৫)।
সাধারণভাবে দোভাষী পুথি হিসেবে পরিচিত এরূপ কাব্যরীতির প্রতি সৈয়দ হামজার বেশ আকর্ষণ ছিল।
জৈগুনের পুথি (১৭৯৭) ও হাতেম তাই-এ
মোহাম্মদ দানেশ রচনা করেছেন 'চাহার দরবেশ', 'গুলবে সানায়োরা'। কবি আবদুল হাকিম 'গাজী কালু চম্পাবতী' রচনায় বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন।
জঙ্গনামা শ্রেণীর কাব্যধারার উল্লেখযোগ্য কবি ও কাব্যের নাম হলো
শেখ ফয়জুল্লাহ- ষোলশতক-জয়নবের চৌতিশা
দৌলত উজির বাহরাম খান- ষোল শতক- জঙ্গনামা
মুহম্মদ খান- সতের শতক- মক্তুল হোসেন

কবিওয়ালা
কবিওয়ালাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– গোঁজলা গুই, ভবানী বেনে, রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, কেষ্টা মুচি, নিতাই বৈরাগী, ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি, নীলমণি পাটনী প্রভৃতি।
টপ্পা থেকেই আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার সূত্রপাত বলে ধারণা করা হয়।
পাঁচালি গানের শক্তিশালী কবি দাশরথি রায় বা দাশু রায়ঢ। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঁচালি গানকে জনপ্রিয় করেছিলেন।
হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, দাশরথি রায়, রাম বসু প্রমুখ বিখ্যাত কবিওয়ালা তার সমসাময়িক ছিলেন।

লোকসাহিত্য ও গীতিকা

ডাক ও খনার বচনকে লোকসাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
লোক সাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া।
ব্যালাড বলতে আখ্যানমূলক লোকসঙ্গীতকে বুঝায়। বাংলাদেশে সংগৃহীত গীতিকা তিন ধরনের- নাথ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ব বঙ্গ গীতিকা।
নাথ গীতিকা এক ধরনের ঐতিহাসিক রচনা। স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন ১৮৭৮ সালে রংপুর জেলার কৃষকদের নিকট থেকে এগুলো সংগ্রহ করে নাম দেন 'মানিক রাজার গান'।
বর্তমান নেত্রকোণা জেলার আইরথ নামক সস্থানের অধিবাসী চন্দকুমার দে এসব গাঁথা সংগ্রহ করেন।
এরপর ১৯২৩-৩২ খ্রিষ্টাব্দে ড. দীনেশ চন্দ্র সেন এই গানগুলো সম্পাদনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশ করেন। মৈমনসিংহ গীতিকায় ১০টি গীতিকা স্থান পেয়েছে এগুলো হলো মহুয়া, চন্দ্রবতী, দস্যু কেনারামের পালা, দেওয়ানা মদিনা।
এখানে কোচ, গারো, হাজং, রাজবংশী প্রভৃতি মাতৃতান্ত্রিক উপজাতির বাস।
নারীর ব্যক্তিত্ব, সতীত্ব, স্বাতন্ত্র্য, আত্মবোধ প্রভৃতি ছিল মৈমনসিংহ গীতিকার বৈশিষ্ট্য।
মৈমনসিংহ গীতিকা বিশ্বের ২৩টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
মনসুর বয়াতি রচিত 'দেওয়ানা মদিনা' পালাটি মৈমনসিংহ গীতিকার অন্যতম গীতিকা হিসেবে সমাদৃত।
পালাটির রচয়িতা দ্বিজ কানাই, সংগ্রহ ও বর্ণনা করেছেন পল্লিকবি জসীম উদ্দীন।
ড. দীনেশ চন্দ্র সেন ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, সিলেট ও ত্রিপুরা থেকে কিছু গীতিকা সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে ১৯২৬ সালে পূর্ববঙ্গ গীতিকা নামে তিনখণ্ডে প্রকাশ করেন। এর চুয়াল্লিশটি গীতিকার মধ্যে ত্রিশটি গীতিকাই পূর্ব ময়মনসিংহ থেকে সংগৃহীত।
গদ্যের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণিত হলে তাকে লোককথা বা লোককাহিনী বলে।
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের সংগৃহীত রূপকথার নাম 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর রূপকথা সংগ্রহের নাম 'টোনাটুনির বই'।
বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েলি ব্রতের সঙ্গে সম্পর্কিত কাহিনী অবলম্বনে ব্রতকথার বিকাশ ঘটেছে।
হারামনি প্রাচীন লোকগীতি। এটি সংগ্রহ করেছেন মোহাম্মদ মনসুর উদ্দিন।

আধুনিক যুগ

রবীন্দ্রপূর্ববর্তী সাহিত্য

রবীন্দ্র পূর্ববর্তী উপন্যাস

রবীন্দ্র পূর্ববর্তী কবিতা

গীতিকবিতা

রবীন্দ্রপূর্ববর্তী নাটক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের